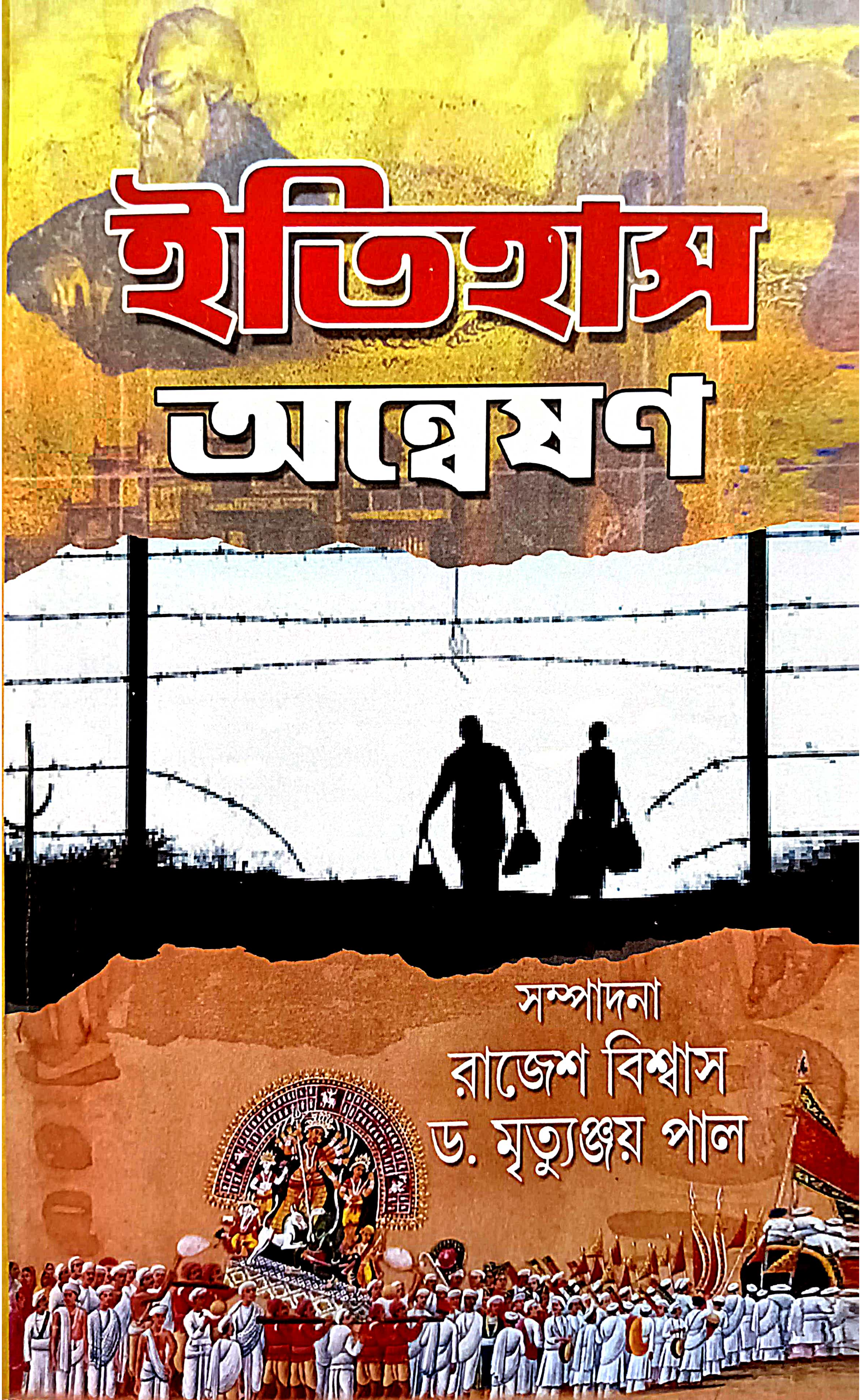

ইতিহাস অন্বেষণ

সম্পাদনা

রাজেশ বিশ্বাস

ড. মৃত্যুঞ্জয় পাল

ISBN 978-93-93490-46-9
Vol. I, Year 2024

ইতিহাস অন্বেষণ

প্রথম বার্ষিকী আন্তর্জাতিক স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত
নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

প্রথম খণ্ড, বর্ষ ২০২৪

সম্পাদনা
রাজেশ বিশ্বাস
ড. মৃত্যুঞ্জয় পাল

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস অব মার্জিনাল পিপল
৪৫৫, শ্রীরামপুর রোড, গড়িয়া
কলকাতা – ৭০০ ০৮৪

ITIHAS ANWESHAN

The Peer-reviewed Proceedings Volume of First International Annual Conference on Society & Culture of Bengal Through the Ages

বই প্রকাশের জন্য যোগাযোগ: 9679729458 /8240400670

ISBN 978-93-93490-46-9
Vol. I, Year 2024

G.S.S.M.P. 2024

Garia Society for Studies of Marginal People
[Reg. No. S0014623 of 2020-2021]
Sreerampur Road, Garia, Patuli, Kolkata – 700 084
Email : editorjphc2015@gmail.com
Contact No. 8240400670 / 9679729458

Rs. 500/-

ইতিহাস অন্বেষণ

প্রথম বার্ষিকী আন্তর্জাতিক স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ
পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

প্রথম খণ্ড, বর্ষ ২০২৪

প্রকাশক
দিশা প্রকাশনী
৩৭/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১

মুদ্রণ
দি নিউ মাকালী প্রেস

গ্রন্থস্বত্ব
গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস অব মার্জিনাল পিপল ২০২৪

মূল্য
৫০০ টাকা মাত্র

Itihas Anweshan, Vol. I, 2024, ISBN 978-93-93490-46-9

প্রবন্ধ- ১১

স্থানীয় রাজনীতি ও চটকল শ্রমিক : প্রসঙ্গ গারুলিয়া মিল শহর (১৯৪৭-২০১১)

শত্রুঘ্ন কাহার*

স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রথম পর্বেও অভিবাসী চটকল শ্রমিকদের গ্রামীণ সম্পর্ক বজায় থাকায়, শহরে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস না করার কারণে চটকল অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা খুব একটা বিকশিত হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন পর্যন্ত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের মত সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হত না। সম্পত্তি ও করদানের উপর নির্ভরশীল ছিল ভোটদানের অধিকার। তার ফলে পৌর রাজনীতিতে শ্রমিকরা খুব একটা সক্রিয় হতে পারেনি। পুরসভার শ্রমিক অঞ্চলগুলির জন্যও ভদ্রলোক অধ্যুষিত পৌর কর্তৃপক্ষের খুব একটা নজর বা চিন্তাভাবনাও ছিল না। প্রায় সবকটি শিল্প শহরগুলির ক্ষেত্রেই এই কথা সমভাবে সত্য। কিন্তু স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে (Institutional politics) অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলেও কিছু স্থানীয় চাহিদাকে কেন্দ্র করে কিছু সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডকে (collective activities) চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেখানে অভিবাসী শ্রমিকদের আগ্রহ ও উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ১৯৮১ সালে পৌর নির্বাচনেও সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে শ্রমিকদের স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাদের স্থানীয় রাজনীতি মূলত পরিচালিত হত, স্থানীয় অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে, যার চরিত্র ছিল বহুলাংশে বিহার, উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতির মত। বস্তুত মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চেয়ে স্থানীয় রাজনীতির বিস্তর ফারাক ছিল, যা সমগ্র মিলকেন্দ্রিক শহরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যতে পরিণত হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে এমনই এক মিল শহর গারুলিয়ার পৌর রাজনীতিতে চটকল শ্রমিকদের অবস্থান অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৫৫ সালে রিষড়ায় প্রথম চটকল গড়ে উঠলেও বাংলায় বাঙালিদের এই শ্রমনিবিড় কর্মে অনীহা ও অন্যান্য কারণের ফলে ১৮৯০ এর দশক থেকেই দলে দলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা তথা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শ্রমজীবীরা বাংলায় ভিড় করতে থাকে, যদিও তৎকালীন বিহার বাংলারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। প্রথম দিকে এই শ্রমজীবীরা মূলত বাংলায় অভিবাসী শ্রমিক হিসাবেই কাজ করত, চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে মূলত পরিবারবিহীন একাকী জীবনযাপন করত, ছুটির নির্দিষ্ট সময়পর্বে নিজের দেশগ্রামে ফিরে যেত, চটকলের কাজে অবসর গ্রহণের পর বাকি জীবন মূলত গ্রামেই সপরিবারে কাটত। বাংলা তখনও তাদের স্থায়ী আবাসস্থল হয়ে ওঠেনি। বিবাহ থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত গ্রামে। ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য।[১]

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
E-mail: skahar0072015@gmail.com

তবে ক্রমশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে প্রাক্-স্বাধীনতার শেষ দশক বা ১৯৪০ এর দশক থেকে। এই সময় থেকেই শ্রমজীবীদের মধ্যে একদল মানুষ ক্রমশ গ্রাম থেকে পরিবার নিয়ে এসে বাংলায় স্থায়ী বসবাস করতে শুরু করে, যদিও তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না। কিন্তু বাংলায় স্থায়ী বসবাসের এক প্রবণতার জন্ম এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যেতে থাকে। স্বাধীনতার উত্তর পর্বে এই প্রবণতা বিভিন্ন কারণে বেশ বেগ পায়। সম্ভবত স্বাধীনতার সময় পর্বে দাঙ্গাজনিত কারণে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মুসলিমরা বাংলায় চলে আসতে শুরু করে। এই মুসলিমদের একটা বিরাট অংশ ১৯৫৫ সালের পর নেহরু লিয়াকত চুক্তির পর বাংলাতেই স্থায়ী বসবাস শুরু করে, দেশগ্রামে ফিরে যাওয়ার সাহস তারা পায়নি। তাছাড়া হিন্দীভাষী হিন্দু শ্রমজীবীর তুলনায় হিন্দীভাষী মুসলিম (এরা উর্দুভাষা শিখলেও, মূলত কথা বলত হিন্দীতে) শ্রমজীবীদের মধ্যে বাংলায় প্রাক-স্বাধীনতা আমল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রবণতা বেশিমাত্রায় দেখা যায় সম্ভবত ১৯৩৭ এর পর বাংলায় দীর্ঘকাল মুসলিম লীগের প্রভাব থাকার ফলে। এমন কি সুহরাবর্দি নিয়ন্ত্রিত ১৯৪৬ সালের বাংলার কেবিনেট রিপোর্টে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত মুসলিমদের রিলিফ কর্মের পাশাপাশি এই হিন্দীভাষী মুসলিমদের সরকারী কাজে বেশী করে সংযুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[২] স্বভাবতই মুসলিমরা হিন্দীভাষী হিন্দুদের তুলনায় বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় তারা বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় স্থায়ী বসবাস করতে থাকে। কিন্তু হিন্দীভাষী হিন্দু শ্রমজীবীদের আরও কিছু সময় লেগেছিল বাংলাকে নিজের স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা করতে। সম্ভবত ১৯৫০ এর দশকের শেষ থেকে এই প্রবণতা ধীরে ধীরে গতি পেতে থাকে। ইতিপূর্বে স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের তেমন কোন অংশগ্রহণ নজরে পড়ে না। এ পর্বে চটকল মিলশহরগুলির স্থানীয় রাজনীতি অনুধাবনের জন্য গারুলিয়ার পৌর রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

নোয়াপাড়া বিধানসভা অন্তর্গত গারুলিয়া পৌরসভা রাজনৈতিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান তার রাজনৈতিক বৈচিত্র্যময়তা গঠনে সাহায্য করেছে। উক্ত অঞ্চলের উত্তরে ভাটপাড়া, দক্ষিণে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা, পূর্বে গড়শ্যামনগর পঞ্চায়েত এবং পশ্চিম বরাবর হুগলী নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে গারুলিয়া ডানবর কটন মিল গড়ে ওঠে এবং ঠিক বাবুঘাট ফেরী পেরিয়ে দেখা যায় সুবিশাল চিমনী যেগুলি একদা অনর্গল ধোয়া নিঃসরণ করত, চটকলের সাইরেনের আওয়াজে জনজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত। পিনকলেও গড়ে ওঠে গৌরিশঙ্কর জুট মিল। মূলত এই জুট মিলগুলিকে কেন্দ্র করেই গারুলিয়া বস্তি অঞ্চলের উত্থান। ডানবর কটন মিলকে কেন্দ্র করে শ্যামনগর স্টেশনের অনতিদূরে গড়ে ওঠে কুলি লাইন। ৮০র দশকে কটন মিল বন্ধ হলে, কটন মিলে কর্মরত শ্রমিকরা চটকলের দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে চটকলে কাজের সাথে যুক্ত শ্রমজীবীরাও ধীরে ধীরে সপরিবারে মিল অঞ্চলে আসতে শুরু করলে তারা ক্রমশ কুলি লাইন থেকে বেরিয়ে এসে গারুলিয়ার বস্তি অঞ্চলে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

গারুলিয়া পৌরসভা অঞ্চলের জনসংখ্যা[৩]

বছর	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি তথা হ্রাস
১৯০১	৭,৩৭৫	

বছর	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি তথা হ্রাস
১৯১১	১১,৫৮০	+৫৭.০%
১৯২১	১৩,০৯৬	+১৩.১%
১৯৩১	১৪,০৩৩	+৭.২%
১৯৪১	২০,১৫০	+৪৩.৬%
১৯৫১	২৮,৩০৪	+৪০.৫%
১৯৬১	২৯,০৪১	+২.৬%
১৯৭১	৪৪,২৭১	+৫২.৪%
১৯৮১	৫৭,০৬১	+২৮.৯%
১৯৯১	৮০,৯১৮	+৪১.৮%
২০০১	৭৯,৯২৬	-১.২%
২০১১	৮৫,৩৩৬	+৬.৮%

Sources: District Census Handbook North Twenty-Four Paraganas, Census of India 2011, Series 20, Parth Xii A, also Section II Town Director, Pages 781-783 Statement I; Growth History, pages 799-803. Directorate of Census Operations V, West Bengal Retrieved, 11 June 2018.

এই পৌরসভা অঞ্চলে বর্তমানে ৮৫,৩৩৬ জন মানুষ বাস করে। ১৯০১ স্থানীয় জনসংখ্যা ৭,৩৭৫ জন হলেও উক্ত অঞ্চলে মিল স্থাপনের সাথে সাথে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরিউক্ত সারণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত গারুলিয়ার জনসংখ্যা ক্রমশ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তথা চতুর্থ দশকে যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ, ১৩ শতাংশ ৭ শতাংশ এবং ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পরপরই এই বৃদ্ধি গিয়ে ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ শতাংশ। মনে রাখতে হবে এই সময়পর্বে বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে এক বিশাল দাঙ্গা পীড়িত মুসলিম সম্প্রদায় বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪] তাদের কিছু অংশ এই গারুলিয়া অঞ্চলেও আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্বে এই বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় পর্বে সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে আন্দোলন, ধর্মঘট, বন্ধ তথা ছাঁটাই এর মত ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়ে যাওয়ায় চটকল শ্রমজীবীদের আয়ের নিশ্চয়তা ক্রমশ কমতে থাকে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাদের প্রাক-স্বাধীনতা দ্বৈত চরিত্র বর্তমান থাকায় বাংলার চটকলের এই অনিশ্চিত জীবন তাদের তেমন হাতছানি দেয়নি। অন্যদিকে ১৯৫১ থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত চটকল শিল্পাঞ্চল জুড়ে একের পর এক আন্দোলনের ফলে চটকলের চাকরি জীবনে একটি নিশ্চয়তা ফিরে আসতে থাকে, শ্রমজীবীরা

ক্রমশ স্থায়ী শ্রমিকের সম্মান পায়, সাথে প্রফিডেন্ট ফান্ড, ই. এস. আই, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি আইনি অধিকারে পরিণত হয়, বেতনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এইসব কারণেই ১৯১১ এর পর ১৯৭১ সালে উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি প্রায় ৫২ শতাংশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ওপার বাংলা থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের আগমন, গারুলিয়া ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এদের ক্যাম্পের অস্তিত্ব আজও বিভিন্ন অঞ্চলের নাম থেকে (যেমন- ডি-ক্যাম্প, হঠাৎ কলোনি ইত্যাদি) বুঝতে অসুবিধে হয় না। উক্ত অঞ্চলের লেলিননগর, দেশবন্ধুনগর, নিরঞ্জননগর, রাধানগর কলোনি, বাঁশবাগান ইত্যাদি মূলত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দ্বারা গঠিত অঞ্চল। চটকলের কর্মজীবনের এই নিশ্চয়তা তাদের ক্রমশ এই অঞ্চলে আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে বাংলার চটকলগুলির অবস্থা ক্রমশ করুণ হতে শুরু করে, শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘট, আন্দোলনের তুলনায় মালিকদের দ্বারা সংগঠিত লক-আউটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মিল মালিক নিজ শর্তে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করে। তীব্র সংগ্রামে অর্জিত যাবতীয় শ্রমিক অধিকারকে মিল মালিকরা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের ক্রমশ অস্থায়ী বা ক্যাজুয়েল শ্রমিকে পরিণত করে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে চটকলের কাজের প্রতি তেমন আর আগ্রহ থাকল না যার প্রতিফলন দেখা যায় পৌরসভা অঞ্চলের জনসংখ্যা সারণীতে। ২০০১ সালে প্রথমবার উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা ১.২ শতাংশ হ্রাস পায়, যদিও ২০১১ সালে জনসংখ্যা ৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় এই বৃদ্ধি অভিবাসনের ফলে সংগঠিত হয় নি।

স্বভাবতই গারুলিয়া পৌরসভা একটি বহু ভাষাভাষী, ভিন্ন জাতি ও ধর্মের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়, যা স্থানীয় মানুষের ভাষায় মিনি ইন্ডিয়া, যেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টানরা যেমন বসবাস করে তেমনি ওপার বাংলা থেকে আগত হিন্দু বাঙালি, স্থানীয় এপার বাংলার বাঙালি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত হিন্দু বিহারী, মুসলিম বিহারী, মাদ্রাসী, ওড়িয়া প্রভৃতি মানুষ একত্রে বসবাস করে। যদিও স্থানীয় পৌরসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে ওপার বাংলার বাঙালি তথা এপার বাংলার বাঙ্গালিরা সম্মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের প্রভাবই দীর্ঘদিন থেকেছে। কিন্তু হিন্দি ভাষীরা ক্রমশ এই পৌরসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অংশীদারে পরিণত হতে থাকে ১৯৯০ এর দশক থেকে।

স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রথম পর্বেও অভিবাসী চটকল শ্রমিকদের গ্রামীণ সম্পর্ক বজায় থাকায় শহরে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস না করার কারণে চটকল অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা খুব একটা বিকশিত হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন পর্যন্ত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের মত সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পৌরসভার নির্বাচন হত না। সম্পত্তি ও করদানের উপর নির্ভরশীল ছিল ভোটদানের অধিকার। তার ফলে পৌর রাজনীতিতে শ্রমিকরা খুব একটা সক্রিয় হতে পারেনি। পৌরসভার শ্রমিক অঞ্চলগুলির জন্যও ভদ্রলোক অধ্যুষিত পুর কর্তৃপক্ষের খুব একটা নজর বা চিন্তাভাবনাও ছিল না। প্রায় সবকটি শিল্প শহরগুলির ক্ষেত্রেই এই কথা সমভাবে সত্য।[৫] কিন্তু স্থানীয়

প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে (Institutional politics) অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলেও কিছু স্থানীয় চাহিদাকে কেন্দ্র করে কিছু সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডকে (collective activities) চিহ্নিত করা যেতে পারে যেখানে অভিবাসী শ্রমিকদের আগ্রহ ও উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এক্ষেত্রে তাদের প্রথম চাহিদা ছিল বাসস্থান। মিলে কাজ করার জন্য মিলশহরে তাদের থাকার একটা জায়গার প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বেশীরভাগ মিল শ্রমিকরা মিলের শ্রমিক কোয়ার্টারে জায়গা না পেয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে নির্মিত প্রাইভেট বস্তিতে বসবাস করত। মিল অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা আন্দোলন করলে অনেক সময় মিল মালিকদের প্রত্যাঘাত নেমে আসত এই সব বস্তির উপর। মিল মালিকরা, সর্দার বা স্থানীয় বাহুবলীদের (মস্তান) মাধ্যমে বস্তি উচ্ছেদে উদ্যোগী হত। এই বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেখা দিত শ্রমিক প্রতিরোধ। বিশেষত আলোচ্য পর্বে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সপরিবারে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস শুরু করলে বাসস্থানের গুরুত্ব ও চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বস্তির দুঃসহ জীবন ও শ্রমিকদের প্রতিরোধের জ্বলন্ত চিত্র পাওয়া যায় সমরেশ বসুর 'বি.টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে।[৬]

স্থানীয় রাজনীতিতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল স্থানীয় ব্যায়ামাগার। স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ব্যায়ামাগার গঠন ছিল একটি পরিচিত ঘটনা, যা স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী ধারাকে পুষ্ট করেছিল। কিন্তু চটকল শ্রমিক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক পর্বের শেষ দিকে এবং স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রথম দিকে ব্যায়ামাগার বা আখড়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত না থাকলেও অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। চটকল অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দিভাষী নেতাদের উত্থানের ইতিহাসে এইসব ব্যায়ামাগারের এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র পাওয়া যায়।

সময়ের সাথে সাথে অভিবাসী চটকল শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাসের প্রবণতা বাড়লেও স্থানীয় রাজনীতিতে অনেকদিন পর্যন্ত বামপন্থীদের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি ১৯৬০ এর মধ্যভাগ থেকে একের পর এক চটকল ধর্মঘট ও আন্দোলনে বামপন্থীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান, ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্র বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করলেও শ্রমজীবী বস্তি অঞ্চলগুলিতে এই বামপন্থীরা, যারা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাংলাভাষী, বহিরাগতই থেকে যান। মিলের ভেতরে বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই. এস. আই প্রভৃতি অর্থনৈতিক দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের সাথে বামপন্থী নেতারা একটা আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরিতে সফল হলেও, স্থানীয় স্তরে অভিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে তাদের কোনো যোগসূত্র না থাকায়, ১৯৬৭ সালের পরে বেশ কয়েক দশক পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যমান থাকলেও শ্রমিকদের স্থানীয় জীবনে তারা ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। হয়তো জায়গা করে নেবার কোনও চেষ্টাও তারা করেনি। স্থানীয় রাজনীতির পরিধিতে ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্থানীয় সমস্যা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে উত্তর ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিচ্ছবি জায়গা করে নিতে থাকে।

এই অঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলনের বিস্তারের প্রথম যুগে অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে স্থানীয় কমিউনিস্ট সংগঠকরা, যেমন যামিনী সাহা, অমিয় মুখার্জি, নিমাই সাহা (ফ. ব.), রবীন্দ্রনাথ বসাক (ওরফে যদু মাস্টারমশাই) প্রমুখরা হিন্দীভাষী শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন এবং হিন্দীভাষী চটকল শ্রমিকদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা ছিল সহজেই অনুমেয়। (তাঁদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত একমাত্র নিমাই সাহা যিনি গারুলিয়া পুরসভার সর্বশেষ নির্বাচনেও একমাত্র বামপন্থী কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত) ১৯৬৯, ১৯৭২, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৯ সালে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের সময় এঁদের নেতৃত্বেই শ্রমিকরা অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

এই সময় পর্বেই রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনে সমগ্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে দয়ারাম বেরী (ভাটপাড়া), কৃষ্ণ কুমার শুক্লার (টিটাগড়) মত প্রবীণ নেতাদের জায়গায় কমরেড গোপাল বসু (নৈহাটি), যামিনী সাহা (নোয়াপাড়া), সীতারাম গুপ্তর (ভাটপাড়া) মত কমিউনিস্ট নেতাদের উত্থান লক্ষ্য করা যায়।[৭] এঁদের মধ্যে একমাত্র সীতারাম গুপ্তা ছিলেন হিন্দীভাষী।

গারুলিয়া অঞ্চলে যেসব জনপ্রিয় বাঙালি বামপন্থী নেতাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কোন হিন্দীভাষী স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা বা অগ্রণী কর্মীর নাম পাওয়া যায় না, যদিও বা দু-একজনের নাম পাওয়া যায়, স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁদের তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা চোখে পড়ে না। তাছাড়া এইসব প্রবীণ জনপ্রিয় বামপন্থী বাঙালি নেতারা তাদের স্থানে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে বাঙালি নেতৃত্ব তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যারা হিন্দীভাষীদের মধ্যে এইরকম গ্রহণযোগ্যতার অধিকারী হবেন। আবার স্থানীয় হিন্দীভাষী শ্রমিকদের মধ্যে থেকেও তারা উপযুক্ত ক্যাডার তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যাঁরা নেতৃত্বের কোন ধাপে উঠে আসতে পারেন। তাছাড়া এই প্রবীণ বামপন্থী নেতৃত্ব অর্থনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছাড়া হিন্দীভাষী শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনে কতটা মিশে যেতে পেরেছিলেন বা স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে কতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে। এই অবস্থায় হিন্দীভাষী শ্রমিকদের নেতৃত্বের স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন কিছু অবামপন্থী অ-কমিউনিস্ট হিন্দীভাষী স্থানীয় নেতারা।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতে সর্দারদের চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব প্রতিপত্তি দারুণভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তাই তারা বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সর্দাররা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় রাজনীতিতে অবাঙালি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। কালক্রমে মিলের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকে এবং রাজনীতিই হয়ে ওঠে এই নবোদিত নেতাদের প্রধান পেশা। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলে ঈশাক সর্দারের ৩ মাসের হাজতবাস সর্দারদের স্থানীয় রাজনীতিতে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে ওঠার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে।[৮] গারুলিয়া অঞ্চলেও এই সর্দারদের সক্রিয়তা ক্রমশ এই সময়পর্ব থেকে লক্ষ্য করা যায়। এদের বলা হয়

ক্রমশ প্রভাব বিস্তার তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছিল। এই পরিস্থিতিতে একদিকে তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আতঙ্কিত কেদার সিং ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়তে বাধ্য হন এবং লোকদলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন, অন্যদিকে সি. পি. আই. এম. কর্মী সমর্থকবৃন্দও নিমাই সাহার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রোধ করার জন্য এক বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান পান কেদার সিং এর মধ্যে। কেদার সিংও বামফ্রন্টের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করে নিজের পায়ের মাটি শক্ত করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮১ এর নির্বাচনে কেদার সিং শিউ কুমার সিং নামে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং জয়ী হয়ে উপ পৌরপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন।[১৪] পার্টির এই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল ছিল যে ১৯৯৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জগদ্দল বিধানসভায় বিগত ২০ বছরের বিধায়ক নীহার বসু কংগ্রেস প্রার্থী অনয়গোপাল সিনহার কাছে পরাজিত হন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জগদ্দল বিধান সভায় ১৯৭৭ থেকে ২০১১-এ রাজ্যের বাম বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত বামেদের দখলেই ছিল শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন বাদ দিলে।[১৫]

অন্যদিকে পৌর নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি হিন্দীভাষী শ্রমজীবীদের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। এই সময়পর্বে তারা ক্রমশ বাংলায় স্থায়ী বসবাস শুরু করায়, তাদের স্থানীয় চাহিদার পাশাপাশি পৌর পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে পৌর নির্বাচনে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা বাম দল ও লাল ঝাণ্ডার ওপর আস্থা রাখলেও, স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান ছিল ঠিক এর বিপরীত। তার একাধিক কারণ ছিল, যেমন মিল অভ্যন্তরের রাজনীতির ক্ষেত্রে বাম কর্মসূচীর সাথে এই হিন্দীভাষী শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের মেলবন্ধন হলেও, স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থীদের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে এই হিন্দীভাষী শ্রমজীবীদের সমাজ সংস্কৃতির বিস্তর তফাৎ ছিল। তাদের স্থানীয় চাহিদার সাথে বাম কর্মসূচীর মেলবন্ধন সম্ভব হয়নি বললেই চলে। অন্যদিকে ছিল বাম বাবু কালচারের সাথে স্থানীয় ভাইচারা দুই মেরু। বাম নেতৃত্ব সবসময় এই শ্রমজীবীদের কাছে শ্রদ্ধেয় হলেও আপন হয়ে উঠতে পারেনি, একটা দূরত্ব সব সময় থেকেছে। অন্যদিকে স্থানীয় নেতা হয়ে ওঠা সর্দারদের সাথে তাদের এক আন্তরিক যোগ থাকছে। সেই বাংলায় আগমনের কাল থেকেই সর্দাররা তাদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে গেছে, শ্রমজীবীরা মিল বহির্ভূত যাবতীয় সমস্যা এমনকি পারিবারিক অশান্তি মীমাংসার জন্যও এই সর্দারদের শরণাপন্ন হত। এছাড়া ছিল ভাষাগত বাধা। পৌর পরিষেবা পেতে গেলে পৌরসভায় হিন্দীভাষী নেতার প্রয়োজনীয়তা তারা প্রথম থেকেই অনুভব করতে পেরেছিল। হিন্দীভাষী শ্রমজীবীরা এমন নেতাকেই সমর্থন জানাবে যার কাছে তারা নিজ ভাষায় অভাব অভিযোগ জানাতে পারে, যাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোনও প্রোটোকল অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্থানীয় রাজনীতিতে অবামপন্থীনেতাদের উত্থান ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কিছু ঘটনাবলী যা হিন্দীভাষী শ্রমজীবীদের মনে কেদার সিং এর ভাবমূর্তি শক্ত করতে সহায়ক হয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গারুলিয়া অঞ্চল জুড়ে প্রচারিত হয় যে পৌরসভার অফিস বিল্ডিং স্থানান্তরিত করা হবে, যদিও এই পরিকল্পনা ছিল মৌখিক, খাতায় কলমে এই বিষয়ে কোনও অগ্রগতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই

মৌখিক পরিকল্পনাই গারুলিয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন বাম মহলে পৌর প্রশাসনে হিন্দীভাষীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার জন্যই পৌর বিল্ডিং স্থানান্তরের কথা ভাবা হয়েছিল। পৌর প্রশাসনের বিল্ডিং স্থানান্তরিত হোক বা না হোক এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কেদার সিং আন্দোলনে অবতীর্ণ হন এবং পৌর বিল্ডিংএর সামনেই অবস্থানরত থাকেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ড একদিকে হিন্দীভাষী শ্রমজীবীদের মনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় অন্যদিকে বাম নেতৃত্বের প্রতি এক সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।[১৬] এর পরবর্তীকালে কেদার সিং গারুলিয়া অঞ্চল জুড়ে খাটা পায়খানা তুলে দেওয়া, আহির সম্প্রদায়ের খাটাল বাঁচাও এর মত একাধিক স্থানীয় সমস্যা নিয়ে জনগণের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে থাকেন। মনে রাখতে হবে ইতিপূর্বে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য জুড়ে খাটা পায়খানা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এই বিষয়টা কেদার সিং হিন্দীভাষীদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরে যে, তাদের কাছে মনে হয় কেদার সিং এর আন্দোলনের ফলেই খাটা পায়খানার অবসান ঘটেছে। এছাড়া ছিল স্থানীয় স্তরে সম্প্রদায়গত বা পারিবারিক সমস্যা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য শ্রমজীবীরা কেদার সিং এর কাছে আসত। কেদার সিং এর ব্যায়ামাগারে অনুশীলনরত ছেলেরাই ছিল তাঁর বাহুবল, ফলে কোন সমস্যার যে সমাধান তিনি নির্দেশ করতেন তা দুই পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকত। এই ভাবে কেদার সিং তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে নিমাই সাহার প্রভাব রোধ করতে সি. পি. আই. এম. কর্মী সমর্থক গোপনে কেদার সিংকে সমর্থন করতে থাকে। যার পরিণতি স্বরূপ পরবর্তীকালে স্থানীয় রাজনীতিতে কেদার সিং ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য নেতা হিসাবে উঠে আসতে থাকে।

এর ফল কিছু দিনেই দেখা যায় ২০০০ সালের পৌর নির্বাচনে। এই সময় সমগ্র গারুলিয়া পৌরসভা মোট ২১টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে ১০টি ওয়ার্ড (৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৭) এমন ছিল যেখানে হিন্দীভাষীরা নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা নিত। স্বাভাবিক ভাবে অবামপন্থী বোর্ড তৈরি হওয়া ছিল মুশকিল কিন্তু ২০০০ সালের নির্বাচন গারুলিয়া অঞ্চলের বামপন্থীদের রাজনৈতিক হিসেব নিকেশ গণ্ডগোল হয়ে যায়। গারুলিয়া পৌরসভার মোট ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে বামফ্রন্ট ৭টি-তে জয়লাভ করে, ৬টি আসন পায় কংগ্রেস, এই প্রথমবার বিজেপি ১টি ও তৃণমূল কংগ্রেস ৫টি করে আসন এবং ২টি আসন নির্দল প্রার্থী দখল করতে সমর্থ হয়।[১৭] বামপন্থীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস তথা বিজেপি সম্মিলিতভাবে জোট গঠন করে গারুলিয়ায় অবামপন্থী বোর্ড গঠনে সমর্থ হয়, যার নেতৃত্ব দেন কেদার সিং। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কেদার সিং নির্বাচিত হন এবং ২৪শে মে ২০০২ তারিখে অন্যান্য দল সমর্থন তুলে নিলে তিনি পৌরপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ৫ই জুনের মধ্যে নিজের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে সমর্থ হলে তিনি আবার পৌরপ্রধানের পদে আসীন হন। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায় বামপন্থীরা পৌরসভার অবামপন্থী বোর্ড ভেঙ্গে দিতে চায়নি, তাই গোপনে তারাই সমর্থন দিয়ে এই বোর্ডটিকে বজায় রেখেছিল। ১৭ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। ২০০২ সালে গারুলিয়া অঞ্চলে এক মুসলিম যুবতীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কেদার সিং এর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল বনধ ডাকে এবং নোয়াপাড়া পুলিশ স্টেশনের

সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, পরে দোষীদের সত্বর গ্রেফতারের দাবীতে অনশনে বসেন।[১৮] ২০০২ সালে ডিসেম্বর মাসে দিল্লী থেকে ফেরার পথে সম্ভবত হৃদরোগে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ সমগ্র গারুলিয়ার হিন্দীভাষী অঞ্চল জুড়ে ঘোরানো হয় এবং এক বিশাল জনজোয়ারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[১৯]

এরপর ছয় মাসের জন্য সুনীল সিং (কেদার সিং এর পুত্র) এবং পরবর্তী ১০ মাসের জন্য ঊষা চৌধুরী (কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী, পরবর্তী তৃণমূল, বিজেপি দলেও যোগ দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেননি) গারুলিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ২০০৫ এর পৌর নির্বাচনে গারুলিয়া অঞ্চলে বামফ্রন্ট পুনরায় দখল করতে সমর্থ হয়।[২০] ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গারুলিয়া পৌরসভায় মূলত বামপন্থীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই পর্বে কেদার সিং এর মৃত্যু আঞ্চলিক স্তরে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে। ঊষা চৌধুরী, অশোক সিং এর মত হিন্দীভাষী নেতা গারুলিয়ায় উপস্থিত থাকলেও, নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণের যোগ্যতা তাদের ছিল না। কেদার সিং এর মৃত্যু উক্ত অঞ্চলে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটায়। প্রাথমিক ভাবে সিং পরিবারের অভ্যন্তরেও ক্ষমতা দখলের লড়াই পারিবারিক অন্তঃকলহের সূচনা ঘটায়। যদিও এই অন্তঃকলহ কাটিয়ে উঠে গারুলিয়ার নেতা হিসাবে কেদার সিং এর দ্বিতীয় পুত্র সুনীল সিং নিজেকে তুলে ধরে।[২১]

চটকল অঞ্চলে এই অবামপন্থী হিন্দীভাষী নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো বামপন্থী দলগুলির দুর্বলতা। ১৯৭৭ সালে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার পর মোটামুটি প্রায় প্রথম দশকে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই সময় যামিনী সাহা, অমিয় মুখার্জী, নিমাই সাহা, রবীন্দ্রনাথ বসাক প্রমুখের মধ্যে অবাঙালি চটকল শ্রমিকরা দরদী নেতা ও সাথী (comrade) খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু কালের নিয়মে এই প্রথম প্রজন্মের নেতারা অবসর নিলে বা তাদের অবর্তমানে, দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই রকম বাঙালি বা হিন্দীভাষী নেতা সেই স্থান পূরণের জন্য উঠে আসতে পারেনি। এই অবস্থায় স্থানীয় বামপন্থী নেতারা শ্রমিক বস্তি অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতি অবাঙালি অবামপন্থী নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করতেন। এইসব চটকল অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় যে, শুধু সাধারণ অবাঙালি শ্রমজীবী মানুষ নয় এমনকি বামপন্থী সমর্থক ও দরদীরাও মনে করেন যে বামপন্থী আঞ্চলিক নেতৃত্বের সাথে এই অবামপন্থী স্থানীয় হিন্দীভাষী নেতাদের গোপন বোঝাপড়া আছে যা তারা 'সেটিং বা' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করে।[২২]

এই সমঝোতা বা সেটিং এর রাজনীতি করতে গিয়ে সম্ভবত বামপন্থীরা এই হিন্দীভাষী অঞ্চলে তাদের নিজস্ব দলীয় বামপন্থী নেতা তৈরীর কোন আন্তরিক চেষ্টা করেননি- এই বোঝাপড়ার অর্থ ছিল স্থানীয় অঞ্চলে ও মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডগুলিতে এই অবাঙালি হিন্দীভাষী নেতাদের হাতে থাকবে পক্ষান্তরে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়ের পথ তারা নিষ্কণ্টক রাখবেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থী দলগুলোর মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অর্থাৎ লবিবাজি যার ফলে এইসব অঞ্চলে অবাঙালি অবাম নেতাদের উত্থান ও

পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি সফল হয়েছিল। সম্ভবত বামপন্থী দলগুলির সংগঠনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির প্রাধান্য পূর্ববর্তী পর্বের ভাটপাড়ার সীতারাম গুপ্তা (সি. পি. আই. এম.) বা সীতা শেঠ (বলশেভিক পার্টির) মতো নেতাদের কোন উত্তরসূরী তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করেছিল।

২০১১ সালে আচমকা সারা রাজ্য জুড়ে পরিবর্তনের যে ঝড় এসেছিল, তার অনেক আগে থেকে এই অবাঙালি চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বামপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করেছিল। একথা সত্যি যে এই পর্বে (১৯৯০- ২০১১) নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, ব্যারাকপুর সহ সমগ্র চটকল শিল্পাঞ্চলে বামপন্থীদের প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন জয় (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে) এবং নিজের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে বামপন্থীরা তাদের আধিপত্য ও প্রাসঙ্গিকতা অব্যাহত রাখলেও ঐ একই সময়ে বিধানসভার যে বুথগুলি অথবা পৌরসভার যে ওয়ার্ডগুলি অবাঙালি হিন্দীভাষী চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত ছিল, সেখানে অবামপন্থী হিন্দীভাষী নেতাদের প্রাধান্য ক্রমশই অনেক বেশি বাড়তে থাকে।[২৩]

স্থানীয় রাজনীতিতে আধিপত্যের সূত্রে বর্তমানে এই হিন্দীভাষী পরিবারগুলি আঞ্চলিক এমনকি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পা রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের স্থায়ী আনুগত্য থাকে না এবং তাদের রাজনীতিও বিশেষ কোনো মতাদর্শের দ্বারা চালিত নয়। অর্থাৎ উত্তর ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশের মত হিন্দীভাষী অঞ্চলে এক একটি বিশেষ পরিবারকে কেন্দ্র করে রাজনীতি যেভাবে পরিবারকেন্দ্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রূপ ধারণ করে থাকে, হিন্দীভাষী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের চটকল শ্রমিক অঞ্চলগুলিতেও রাজনীতি সেই ভাবে আবর্তিত হতে শুরু করে। এই বাহুবলী নেতারা চটকলে তাদের আধিপত্যাধীন অঞ্চলে অবাম ইউনিয়নগুলিও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

তথ্যসূত্র:

১. শত্রুঘ্ন কাহার, স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনঃ প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১), ইতিহাস এষণা-৩, স. সিদ্ধার্থ গুহরায়, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩০০।

২. Bengal Cabinet Proceeding Papers, Shakespeare Sarani, West Bengal State Archive, dated-16.01.1947, p. 8.

৩. District Census Handbook North Twenty-Four Paraganas, Census of India 2011, Series 20, Parth Xii A, also Section II Town Director, pp. 781-783 Statement I; Growth History, pp. 799-803. Directorate of Census Operations V, West Bengal Retrieved, 11 june 2018.

৪. Bengal Cabinet Proceeding, Bihar Muslim Refeese, Shakespeare Sarani, West Bengal State Archive, 25.02.1957, pp. 11-12.

৫. সৌমিত্র শ্রীমানী, মিউনিসিপ্যালিটি ও মিল : বরানগর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, ইতিহাস অনুসন্ধান ১১, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩০।

৬. সমরেশ বসু, বি. টি. রোডের ধারে, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৩।

৭. দিলীপ ব্যানার্জি, ইলেকশন রেকর্ডার, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল, স্টার পাবলিশিং হাউস, ২০০৬।

৮. IB Report, serial no. 318, File No. 340-48, File Name Ishaq Sardar, Shakespeare Sarani, West Bengal State Archive.

৯. সাক্ষাৎকার: সঞ্জয় সিং, কাউন্সিলার, তৃণমূল কংগ্রেস, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-৪৫, তারিখ- ০৬/০৫/২০১৭।

১০. গারুলিয়া পৌরসভা, রেজোলুশন বুক নং- ৫, ১১.০৫.১৯৭৭-২৭.০১.১৯৮১।

১১. ইজমা বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮২, পৃ. ৬৪।

১২. শত্রুঘ্ন কাহার, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।

১৩. সাক্ষাৎকার: অনিল চৌধুরী, চটকল শ্রমিক, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-২৮, তারিখ- ০৫/০৮/২০১৬।

১৪. গারুলিয়া পৌরসভা, রেজোল্যুশন বুক- ০৬, ২৪.০২.১৯৮১-২৭.০৩.১৯৮৪, তারিখ-১০.০৭.১৯৮১।

১৫. দিলীপ ব্যানার্জি, ইলেকশন রেকর্ডার, বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৯৬, স্টার পাবলিশিং হাউস, ২০০৬।

১৬. সাক্ষাৎকার, বাবলু পাল (ওরফে শ্যামসুন্দর পাল), গৌরিশঙ্কর জুট মিল শ্রমিক, মেম্বার- বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, স্থান- গারুলিয়া ভীমের মোড়, তারিখ-১১/০৬/২০২১।

১৭. গারুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন ফলাফল, ২০০০।

১৮. The Telegraph. Calcutta, July 26, https://www.telegraphindia.com/india/girl-s-murder-disrupts-life-in-noapara/cid/884213, accessed date: 02/01/2022 at 09:35 p.m.

১৯. লেখক নিজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, রাজনৈতিক বোধ না থাকলেও ১০ বছর বয়সী একজন স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে সেও ওই মিছিলে হেঁটেছিল, সমগ্র পাড়ার মানুষ এই যাত্রায় পা মিলিয়েছিল।

২০. https://frontline.thehindu.com/politics/article30205083.ece, accessed Date: 02/01/2023 at 05:43 p.m. গারুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন ফলাফল, ২০০৫।

২১. গারুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন ফলাফল, ২০১০।

২২. শত্রুঘ্ন কাহার, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।

২৩. গারুলিয়া তথা ভাটপাড়া পৌরসভা নির্বাচনী ফলাফল।